বালুচর

জসীম উদ্‌দীন

ডি, এম, লাইব্রেরী

১৩৩৭

প্রথম সংস্করণ—মাঘ ১৩৩৭

৬১, কর্ণওয়ালিস ষ্ট্রীট, ডি, এম, লাইব্রেরী হইতে
শ্রীগোপালদাস মজুমদার কর্ত্তৃক প্রকাশিত।
১২, নন্দ বোস লেন, ভট্টাচার্য্য প্রেস হইতে
শ্রীঅমূল্যচন্দ্র ভট্টাচার্য্য কর্ত্তৃক মুদ্রিত।

মূল্য—এক টাকা

শ্রীগগনেন্দ্র নাথ ঠাকুর ও
শ্রীঅবনীন্দ্র নাথ ঠাকুর—
শ্রীচরণ কমলেষু

তোমরা দু'ভাই রঙ্ লয়ে কর রঙের খেলা
সন্ধ্যা সকাল, সকাল সন্ধ্যা সারাটি বেলা।
ছবি আর ছবি বরণে বরণে আসে ও যায়,
রেখার বাঁধনে কেউ ধরা পড়ে কেহ পালায়।
রঙের সায়রে কমলেরা যেন খেলায় জল,
কেউ ডুবে কেউ জলে ভেসে করে কৌতুহল।
তোমরা দু'ভাই তীরে দাঁড়াইয়া রও যে চেয়ে—
কি যেন কুড়াও, কি যেন হারাও, কি যেন পেয়ে।
তোমরা দু'ভাই রঙ্ লয়ে খেল রঙের নায়,
রতন মাণিক কুড়ায়ে ফিরিছে সুদূর গাঁয়।
কালেরে তোমরা মানিতে চাহ না,—নিকট-দূর
তোমাদের যেন মুঠার মধ্যে সকল পুর।

কেউ চ'লে যাও রূপকথাপুরে, রাজার কনে
ঘুমাইয়া হাসে হাসিয়া ঘুমায় আপন মনে।
তার সাথে যেয়ে ভাব করে আসো রেখার ডোরে,
তার মনে বাঁধো স্বপনের পর স্বপন ধরে।
কেউ কথা কও পাষাণের সনে, মোগলপুরী—
নানা বরণের লহরে লহরে হাসিছে ঘুরি।
মতিমহলের অজানা হারেমে বাদশাজাদী,
বেদনা তাহার পাষাণে পাষাণে ফিরিছে কাঁদি;
পাষাণে পাষাণে কান পেতে তাই শুনিছ খালি,
আপনার মনে রঙের উপরে রঙেরে ঢালি।

রঙের কুমার চেয়ে থাকি মোরা মুখের পানে,
এত কাছে রও তবু তোমাদের বুঝি না মানে।
তোমাদের বুকে কত রঙ্ আছে? আরো কি কায়া—
তোমাদের ঐ রঙের সায়রে দুলাবে ছায়া!
আরো কত ব্যথা আরো কত হাসি রয়েছে বাকি—
আজো দেখা তারা দেয়নি—যাদেরে লইবে আঁকি?

তোমরা দু'ভাই ছবি আঁকো বসি'—শুধুই ছবি,
কথা নাহি কও রঙে রঙ্ মাখো নীরব কবি।
ভাষার দেশেতে বসতি আমার, অবাক মানি,
তোমাদের সেই কথা-নাই-দেশ কেমন জানি!
সে যেন কেমন রঙে আর রঙে রেখায় রেখা—
টানিয়া টানিয়া মনের কথাটি মনেতে লেখা!
তোমাদের দেশ না জানি কেমন যেখানে সবে,
রঙের বাক্সে কথারে পুরিয়া রয় নীরবে।
সেই দেশে আজি পাঠাইয়া দিনু আমার গান—
তুচ্ছ এ তবু পূর্ণ প্রাণের পূজার দান।

১৩৩৭
গ্রাম, গোবিন্দপুর,
ফরিদপুর

আপনাদের স্নেহের
জসীম

কবি জসীম উদ্‌দীন তাঁর 'রাখালী' ও 'নক্সী কাঁথার মাঠ' প্রকাশ করিয়া অতি অল্প দিনের মধ্যে সাহিত্য-জগতে বিশেষ প্রতিষ্ঠা লাভ করিয়াছেন। এই দু'খানা বইএ বিশেষ করিয়া কবি তাঁর ছায়ায়-ঢাকা জলে-ডোবা পূর্ব্ববঙ্গের পল্লী-সৌন্দর্য্য বর্ণনা করিয়াছেন। কবির বর্ত্তমান কাব্যখানা প্রেমের কাব্য। সুদূর বালুচরে কোথা হইতে এক প্রেমিক-প্রেমিকাকে আনিয়া কবি প্রেমের বেসাতি জমাইয়াছেন। তাহারা কভু কৃষাণ-কৃষাণী, কখনও রূপকথার নাগর-নাগরী। কবি কখনও নারীর মুখ দিয়া, কখনও পুরুষের মুখ দিয়া প্রেমের নানা বৈচিত্রের বর্ণনা করিয়াছেন! বৈষ্ণব কবিদের মত কবির বৃন্দাবন তাঁর 'বালুচর' আর যমুনা 'পদ্মানদী'। ইহার প্রায় সবগুলি কবিতাই Realistic touch এ ভরা। নিত্যকার ঘটনাকে কবি প্রায়ই ছাড়াইয়া যান নাই। যদিও এই কবিতাগুলি প্রেমের কবিতা তবু পল্লী ইহার Background হইয়া কবির সহজ সুন্দর বৈশিষ্ট্যের পরিচয় দিতেছে। এগুলি খণ্ড কবিতা হইলেও ইহাদের পরস্পরের মধ্যে একটা সামঞ্জস্য আছে। প্রেমের প্রথম সোপান হইতে আরম্ভ করিয়া তাহার শেষ পরিণতিতে কবি এই কাব্য সমাধা করিয়াছেন। এই বইএর বালুচর নাম করণের একটা সার্থকতা আছে। বালুচর নিত্য ভাঙ্গে, নিত্য গড়ে; তবু চাষী সেখানে তার কুটির বাঁধে, শূন্য চরের বুকে ধানের শ্যামল আঁচল বিছাইয়ে দেয়, নদীর ঢেউএর তালে তালে তার সবুজ হাসি দুলিয়া উঠে। আবার কখনো সুখের নীড়খানি নদীর স্রোতের আঘাতে ভাঙিয়া পড়ে। প্রেমের জগতও এমনি ভাঙিয়া যায় চিরন্তন বেদনার ঘায়ে। মানুষ আবার নতুন করিয়া সে জগত গড়িয়া তোলে। 'বালুচরের' বুকেও এমনি ভাঙ্গা-গড়ার ব্যথা-হাসি আছে।

কবি আমাকে তাঁর বইএর ভূমিকা লিখিতে দিয়াছেন সেজন্য তাঁকে আমার আন্তরিক ধন্যবাদ।

আবু্ নয়ীম মোহাম্মদ বজ্‌লুর রশীদ।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ চিত্রশিল্পী শ্রীযুক্ত নন্দলাল বসু এই পুস্তকের প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিয়াছেন। বাবু সজনীকান্ত দাস, অশোকচন্দ্র চট্টোপাধ্যায়, নিখিলেশ রাহা, কাজী নজরুল ইস্‌লাম, আবুল কাসেম, আব্দুল মজিদ, আব্দুল কাদের, সান্ত্বনা গুহ, বিনয়কৃষ্ণ ঘোষ, মোহন লাল গঙ্গোপাধ্যায় এবং আরো কেহ কেহ এই পুস্তক প্রকাশ করিতে আমাকে নানাভাবে সাহায্য করিয়াছেন। ইহা ছাড়া হিমাংশু কুমার দত্ত, স্বরসাগর প্রথম গানটির সুর-রূপ দিয়াছেন; কৃতজ্ঞতা দেখাইয়া ইঁহাদের স্নেহের অপমান করিতে চাহি না। প্রসিদ্ধ শিল্পী শ্রীসুরেন্দ্রনাথ কর আমার রাখালী পুস্তকের সুন্দর প্রচ্ছদপট আঁকিয়া দিরাছেন। তজ্জন্য তাঁহার নিকট এবং 'প্রবাসীর' শ্রদ্ধাস্পদ কেদারনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নিকট ঋণী রহিলাম। 'রাখালী' ও 'নক্সী কাঁথার মাঠ'এর অনেকে আদর করিয়াছেন, সেই ভরসায় এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

এই বইএর কবিতাগুলি প্রায় একই ছন্দে রচিত। আমার দিক হইতে এ বিষয়ে কিছু বলিবার আছে। মজলিসী আসরে বসিয়া নানা গায়কে নানান সুরের গান গাহিয়া বিভিন্ন রুচির শ্রোতার মনোরঞ্জন করিয়া থাকে। তাহাতে এই অসুবিধা হয় যে কোন গায়কই শ্রোতার মনে কোন স্থায়ী ভাবের অবতারণা করিতে পারে না। এক সুরের গান শ্রোতার মনে ভাল লাগিল,তখন অন্য সুরের অনুগান হইলে অনেক সময় রসভঙ্গ হয়। এই জন্য বাউলদের গানের বৈঠকে যদি কোন গায়ক ভাবের সাথে ভাব মিলাইয়া গান না গাহিতে পারে তবে সে আসরে তাহাকে গান গাহিতে দেওয়া হয় না।

ইহা মনে করিয়া এই পুস্তকে আমি যথাসম্ভব একই সুরের এবং একই ভাবের কবিতাগুলি একত্র গ্রথিত করিয়াছি। আমার উদ্দেশ্য কতটা সফল হইয়াছে সুধী পাঠকবৃন্দ অনুমান করিবেন।

এই কবিতাগুলি বহু দুঃখ সুখের সাথী হইয়া আমার খাতায় আবদ্ধ ছিল। আজ অতি সঙ্কোচের সাথে ইহাদের বাহির কবিলাম। গানের আলোক-তরণী গাঙে ভাসাইয়া দিলাম। কোন গেঁয়ো ঘাটের কোণে যদি কারো মনে ইহা এতটুকুও দোলা দিতে পারে তবেই সমস্ত শ্রম সার্থক হইবে। আমার পূজার ফুল কে কুড়াইয়া লইবে জানি না। আমার মনের এতটুকু সুখ-দুঃখের সাথে হয়ত তার ক্ষণিকের পরিচয় হইবে। জীবনের বন্ধুর পথে ইহাই কি কম সান্ত্বনা?

জ, উ,

—এই কবির লেখা বই—

১। নক্সীকাঁথার মাঠ
২। রাখালী

রঙীন প্রচ্ছদপট সহ

দাম প্রত্যেকখানা একটাকা।

বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ এই কবি সম্বন্ধে বলেন —

"জসীম উদ্‌দীনের কবিতার ভাব ভাষা ও বিষয়-বস্তু
সম্পুর্ণ নতুন ধরণের। প্রকৃত কবির হৃদয়
এই লেখকের আছে। অতি সহজে
যাদের লিখবার শক্তি নেই
এমনতর খাঁটি জিনিস
তারা লিখতে
পারে না।"

সূচী—

বাঁশরী আমার (কল্লোল) ১
উড়ানীর চর (বার্ষিক সওগাত) ৩
সে বসে পড়িছে বই (উত্তরা) ৬
একখানি হাসি (কল্লোল) ৭
কাল সে আসিবে (কল্লোল) ৯
কাল সে আসিয়াছিল (সওগাত ও কল্লোল) ১০
প্রতিদান ১৯
পরাজয় (মুয়াজ্জীন) ২০
কবির সমাধি (সওগাত) ২২
কারে অভিমান (মোহাম্মদী) ২৯
তোমারে ভুলেছি আজ (প্রবাসী) ৩২
দুরাশা (মোয়াজ্জীন) ৪০
বিদায় (সওগাত) ৪১
মুসাফির (প্রবাসী) ৪৭
আর একদিন আসিও বন্ধু (সওগাত ৫১

বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে,
কেমনে পশিব গোধন লইয়া
গাঁয়ের ঘরে।

কোমল তৃণের পরশ লাগিয়া
চরণে নূপুর পড়িছে খসিয়া,
ফেলিতে চরণ উঠে না বাজিয়া
তেমন ক'রে—
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

কোথায় খেলার সাথীরা আমার
কোথায় ধেনু,
সাঁঝের হিয়ায় রঙিয়া উঠিছে
গোখুর-রেণু।

ফোটা সরিষার পাপড়ির ভরে
চোরো মাঠখানি কাঁপে থরে থরে,
সাঁঝের শিশির দুটি পাও ধরে
কাঁদিয়া ঝরে—
বাঁশরী আমার হারায়ে গিয়াছে
বালুর চরে।

উড়ানীর চর

উড়ানীর চর ধূলায় ধূসর
যোজন জুড়ি'
জলের উপরে ভাসিছে ধবল
বালুর পুরী।

ঝাঁকে বসে পাখী ঝাঁকে উড়ে' যায়
শিথিল শেফালি উড়াইয়া বায় ;
কিসের মায়ায় বাতাসের গায়
পালক পাতি' ;
মহা কলতানে বালুয়ার গানে
বেড়ায় মাতি'।

(২)

উড়ানীর চরে কৃষাণ-বধূর
খড়ের ঘর,
ঢাকাই সীমের উড়িছে আঁচল
মাথার 'পর।

জাঙ্‌লা ভরিয়া লাউএর লতায়
লক্ষ্মী সে যেন ছুলিছে দোলায় ;
ফাগুনের হাওয়া কলার পাতায়,
নাচিছে ঘুরি' ;
'উড়ানীচরে'র বুকের আঁচল
কৃষাণ-পুরী।

(৩)

'উড়ানীর চর' উড়ে যেতে চায়
হাওয়ার টানে ;
চারিধারে জল করে ছল ছল
কি মায়া জানে।

ফাগুনের রোদ উড়াইয়া ধূলি
বুকের বসন নিতে চায় খুলি',
পদ ধরি' জল কলগান তুলি',
নূপুর নাড়ে ;
'উড়ানীর চর' চিকচিক করে
বালুর হারে।

(৪)

'উড়ানীচরে' ছাড়-পাওয়া রোদ
সাঁঝের বেলা—
বালু লয়ে তারা মাখামাখি করি'
জমায় খেলা।

কৃষাণী কি বসি সাঁঝের বেলায়
মিহি চাল ঝাড়ে মেঘের কুলায়,
ফাগের মতন কুঁড়া উড়ে যায়
আলোক ধারে ;
কচি ঘাসে তারা জড়াজড়ি করে
গাঙের পারে।

(৫)

‘উড়ানীর চরে’ তৃণের অধরে
রাতের রাণী,
আঁধারের ঢেউ ছোঁয়াইয়া যায়
কি মায়া টানি।

বিরহী কৃষাণ বাজাইয়া বাঁশী
কাল-রাতে মাখে কাল-ব্যথারাশি ;
থেকে থেকে চর শিহরিয়া উঠে,
বালুকা উড়ে ;
উড়ানীর চর ব্যথায় ঘুমায়
বাঁশীর সুরে।

সে বসে পড়িছে বই

শুইয়া সে পড়িতেছে বই—
এ ঘরেতে আর কেহ কোথা নাই শুধু এই আমি বই।
খণ্ড রোদের টুক্‌রো আসিয়া পড়েছে তাহার মুখে ;
—রাঙা মুখে হাসি, তারি ঢেউ লেগে ত্বলিতেছে তারা স্থখে।
খানিক সে পড়ে, খানিক আবার চায় মোর মুখ পানে,
আমি কবিতায় বৃথা মালা গাঁথি বুঝাইতে তার মানে।
তাহার চাউনী, তুটি কালো চোখে, যেন ত্বটি কালো অলি,
হেলিয়া দুলিয়া তু'পায়ে দলিছে মুখের কমল-কলি।
তার ডানাখানি মোর গায়ে লাগা, বিজলীর লতা এসে,
বুঝি ক্ষণকাল বিরাম মাগিছে আমার মেঘের দেশে।
বই সে পড়িছে, কি বই জানিনে, কে জানে কি আছে লেখা,
আমি দেখিতেছি খনে খনে তার মুখেতে হাসির রেখা।
তার রাঙা মুখে হাসি তুলিতেছে, সে হাসির সরোবরে,
তুই গালে তুটো রাঙা রাঙা টোল ফুটিতেছে লীলাভরে।
সেই রাঙা টোলে ভ্রমর বসিত, অথবা তুইটি ফুল,
তুই গালে কেউ বেধে দিয়ে যেতো মিছেমিছি করি ভুল।
না-রে না, ও মুখে যত হাসি ঝরে, আর যত রূপ ঝরে,
হয় ত তাহাই গড়ায়ে গড়ায়ে তুটি টোল যাবে ভরে।
তার রাঙা মুখ—তার রাঙা হাসি, সে বসে পড়িছে বই,—
এ ঘরেতে আজ আর কেহ নাই এই একা আমি বই।

একখানি হাসি

দিন ভর তার বহু কাজ ছিল, এখানে ওখানে ফিরি,
যত্নে ও স্নেহে কাজের মধ্যে ফুটাইতেছিল ছিরি।
মোরে ডাকি কথা বলিবে কখন ? ব্রজের পথের পরে,
সারা দিনমান আঁট ঘাঁট বেঁধে জটিলা কুটিলা ঘোরে।
এ দেশের সব উল্টো ব্যাভার, হাটে হাটে দাও ঢোল,
কেউ শুনিবে না, কেউ আসিবে না বাধাইতে তাহে গোল
কানে কানে কথা বলিবে যখনি অমনি সকলে আসি
না শুনেও তার টীকা-টিপ্পনী বানাইবে রাশি রাশি।
জোরে যাহা বল, কারো ভ্রূক্ষেপ হইবে না শুনিবারে,
চুপি চুপি তাহা ব'লে দেখ দেখি 'ক'জন না শুনে পারে ?

জগৎ জুড়িয়া করে কোলাহল মল্লিনাথের মিতা,
গোপন কথায় ভাষ্য লিখিছে লইয়া নীতির ফিতা।
তবু এরি মাঝে এক কোণে সে যে দাঁড়াল আমারে দেখি,
গোলাপের মত দুটি রাঙা ঠোঁটে একখানা হাসি লেখি'।
একখানা হাসি,—যেন আকাশের একখানা মেঘ ছেয়ে,
পূর্ণ চাঁদের জোছনার জল পড়ছিল বেয়ে বেয়ে।
যেন প্রভাতের সোনালী আলোক বাঁধিয়া পাখার গায়
এক ঝাঁক পাখী উড়ে চলেছিল আকাশের কিনারায়।

যেন গাঁর বধূ প্রদীপ ভাসায়ে গাঁয়ের ঘাটের জলে,
কাঁকণ বাজায়ে কলস হেলায়ে গাঁর পথে গেল চ'লে।

আজিকে তাহার বহু কাজ ছিল. মোরও ছিল ব্যস্ততা,
সবগুলি তার জড়াইয়া দিল একটি হাসির লতা ;—
সেই লতা 'পরে ফুল ফুটেছিল, তাতে ব'সে মধুকর,
কথায় কথায় জোড়া দিতেছিল বেদনার তাজ-ঘর।
একখানি হাসি দেখেছিনু তার,যেন বহুদিন পরে,
দূর দেশ হ'তে অতি চেনা কেউ চিঠি লিখিয়াছে মোরে।
একখানি হাসি ! আকাশ হইতে একটি পাখীর গান,
দুপুরের রোদে লাঙল চষিতে জুড়াল চাষীর কাণ।
একখানি হাসি ! গংকিণীজলে যেন বেহুলার ভেলা,
লখীন্দরের শবদেহ ল'য়ে কোথায় করেছে মেলা।
যেন আকাশের বুকে ভেসে যায় একটী রঙীন ঘুড়ি—
তারি 'পরে যেন বক্ষ রাখিয়া কোথা যাওয়া যায় উড়ি'।
একখানা হাসি ! নহে বহু কথা, নহে প্রিয়, প্রিয়তম,
প্রাণবল্লভ যদিও লেখেনি, নহে তার চেয়ে কম।

ও-যেন কথার গীতগোবিন্দ ! হাফেজের বুলবুলি,
—ওরি মাঝে বসি পাখায় মাথায় তারা গুঁড়ো-করা ধুলি
একখানি হাসি ! বাঁকা তরী বেয়ে এসেছে ঈদের চান্,
যেন তারি গায় লেখা রহিয়াছে ভেস্তের ফরমান।

কাল সে আসিবে

কালকে সে নাকি আসিবে মোদের ওপারের বালুচরে,
এ পারের ঢেউ ওপারে লাগিছে বুঝি তাই মনে ক'রে।
বুঝি তাই মনে ক'রে,
বাউল বাতাস টানাটানি করে বালুর আঁচল ধরে।
কাল সে আসিবে, মুখখানি তার নতুন চরের মত,
চখা আর চখী নরম ডানায় মুছায়ে দিয়েছে কত।
চরের চাষীর ধানের ক্ষেতের মতই তাহার গা,
কোথা বা হলুদ, আব্‌ছা হলুদ, কোথা বা হলুদ না।

কাল সে আসিবে হাসিয়া হাসিয়া রাঙা মুখ খানি ভরি,
এপারে আমার পাতার কুটিরে আমি কিবা আজ করি।
কাল সে আসিবে, ওই বালুচরে, এপারে আমার ঘর,
তার পরে নদী—ঘাটের ডিঙা কাঁপে নদীটির 'পর।
কাল সে আসিবে, নোঙর ছিঁড়িল, দুলিছে নায়ের পাল,
কারে হারায়েছি, কারে যেন আমি দেখি নাই কত কাল।
ও পারেতে চর বালু লয়ে খেলে, উড়ায় বালুর রথ,
—ও খানে সে কাল দুটি রাঙা পায়ে ভাঙিয়া যাইবে পথ।

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, আমি কি আবার হায়,
আসমান-তারা শাড়ীখানি আজ উড়াইব সারা গায় ?
রামলক্ষ্মণ শঙ্খ ত্ব’গাছি পড়িব আবার হাতে,
খোপায় জড়াব কিংশুক-কলি, কাজল চোখের পাতে ;
গলায় কি আজ পরিতে হইবে পদ্ম-রাগের মালা,
কানাড়া ছান্দে বাঁধিব কি বেণী কপালে সিঁদুর-জ্বালা ?
কাল সে আসিবে, মিছাই ছিঁড়িছি আঁধারের কালো কেশ,
আজকের রাত পথ ভুলে বুঝি হারাল উষার দেশ ।

ওই বালুচরে আসিবে সে কাল, তার রাঙা মুখে ভরি,
অফুট উষার সোনার-কমল আসিবে সোহাগে ধরি ।
যে আসিবে কাল, গলায় পরিয়া কুসুম ফুলের হার,
ত্বখানি নূপুর মুখর হইবে চরণ জড়ায়ে তার ।
মাথায় বাঁধিবে ত্বধালীর লতা কচি সীমপাতা কাণে,
বেণুর অধর চুমিয়া চুমিয়া মুখর করিবে গানে ।
কাল সে আসিবে রাই-সরিষার হল্‌দী কোটার শাড়ী,
মটর বোনেরে সাথে করে যেন খুলে দেখে নাড়ি’ নাড়ি’ ।

কাল সে আসিবে ওই বালুচরে, ধারে তার এই নদী,
তারি কূলে মোর ভাঙা কুঁড়ে ঘর বহু দূরে নয় যদি ।
তবু কি তাহার সময় হইবে হেথায় চরণ ধরি,
মোর কুঁড়ে ঘর দিয়ে যাবে হায় মণিমাণিকেতে ভরি ।
সে কি ওই চরে দাঁড়ায়ে দেখিবে বরষার তরুগুলি,
শীতের তাপসী কারে বা স্মরিছে আভরণ গা’র খুলি ?
হয় ত দেখিবে, হয় দেখিবে না, কাল সে আসিবে চরে,
এপারে আমার ভাঙা ঘরখানি, আমি থাকি সেই ঘরে ।

কাল সে আসিয়াছিল

কাল সে আসিয়াছিল ওপারের বালুচরে,
এতখানি পথ হেঁটে এসেছিল কি জানি কি মনে ক’রে!
কাশের পাতার আঁচড় লেগেছে তাহার কোমল গায়,
ছুটী রাঙা পায়ে আঘাত লেগেছে কঠিন পথের ঘায়।
সারা গাও বেয়ে ঘাম ঝরিতেছে, আলসে অবশ তনু,
আমার ছুয়ারে দাঁড়াল আসিয়া,—দেখিয়া অবাক হ’নু।

দেখিলাম তারে—যার লাগি একা আশা-পথ চেয়ে থাকি,
এই বালুচরে মাথা কুটে কুটে ফুকারিয়া যারে ডাকি’।
দেখিলাম তারে—যার লাগি এই উদাস ঝাউ-এর বন,
বরষ বরষ মোর গলা ধরি’ করিয়াছে ক্রন্দন।
দেখিলাম তারে, তবু কেন হায় বলিতে নারিনু ডাকি’
কোন্ অপরাধে আমার ললাটে দিলে এত ব্যথা আঁকি’!
—বলিতে নারিনু, ওগো পরবাসী, দেখিতে এলে কি তাই,
আগুণ জ্বেলেছ যেই ঘন বনে সেকি পুড়ে হ’ল ছাই!
এলে কি দেখিতে—দূর হ’তে যারে হেনেছিলে বিষ-বাণ,
সে বন-বিহগী বেঁচে আছে কিবা জীবনের অবসান!

বলিতে নারিনু—নিঠুর পথিক, কেন এলে মিছামিছি,
অলস চরণ, অবশ দেহটী, সারা গায়ে ঘাম, ছি-ছি !
এত খানি পথ হাঁটিয়া এসেছে কত না কষ্ট সহি'—
তারি কাছে মোর দুখের কাহিনী কেমন করিয়া কহি' !

নয়নের জল মুছিয়া ফেলিনু, মুখে মাখিলাম হাসি,
কহিলাম, বুঝি পূবের সূরুয সাঁঝেতে উদিল আসি' !
আঁচলে তাহারে বাতাস করিনু, চরণ দু'খানি ধুয়ে
মাথার কেশেতে মুছাইয়া দিয়ে বসিলাম কাছে নুয়ে !
কহিলাম,—বড় ভাগ্য আমার, আজিকার দিন খানি
এমনি করিয়া রাখা যায় না কি দুই হাতে যদি টানি !
রবির চলার রথ,
আজিকার তরে ভুলিতে পারে না অস্ত পারের পথ ?
কৌটায় ভ'রে সিঁদুর ত রাখি, আজিকার দিন হায়,
এমনি করিয়া কৌটার মাঝে ভ'রে কি রাখা না যায় !
এই দিনটীরে মাথার কেশেতে বেঁধে রাখা যায় নাকি !—
মিছামিছি কত বকিয়া গেলাম ছাই-পাঁশ থাকি' থাকি' ।
শুনে সে কেবল হাসি-মুখে তার আরও মাখাইল হাসি,
সেই রাঙা মুখে—যে মুখেরে আমি এত ক'রে ভালবাসি ।
মুখেতে মাখিল হাসি,
সোণা দেহখানি নাড়া দিয়ে গেল বুঝি হাওয়া ফুল-বাসী !

কাল এসেছিল এই বালুচরে আর মোর কুঁড়ে ঘরে—
তার পাশে চলে ছোট্ট নদীটি দুইখানি তীর ধ'রে।

—সেই তুই তীরে রবি-শস্যেতে দিগন্ত গেছে ভার'—
রাই সরিষায় জড়াজড়ি করে ফুলের আঁচল ধরি'।
তারি এক তীরে বাঁকা পথখানি, দীঘল বালুর লেখা,
সেই পথ দিয়ে এসেছিল কাল আঁকিয়া পায়ের রেখা।
কাল এসেছিল, চখা আর চখী এ ও'রে আদর করি'
পাখা নেড়েছিল, তারি ঢেউ লাগি' নদী উঠেছিল নড়ি'।
—তারি ঢেউ বুঝি ভেসে এসেছিল আমার পাতার ঘরে—
বহুদিন পরে পেয়েছিনু তারে শুধু কালিকার তরে।

কালিকার দিন, মেরু-কুহেলির অনন্ত আঁধিয়ারে
শুধু একখানা আলোক-কমল ফুটেছিল এক ধারে।
মহা-সাগরের দিগন্ত-জোড়া ফেন-লহরীর 'পরে
প্রদীপ-তরণী ভেসে এসেছিল বুঝি এ-ব্যথার ঝড়ে!
কালকে তাহারে পেয়েছিনু আমি, হায়, হায়, কত কাল,
যারে ভাবি এই শূন্যে বালুচরে চিতায় দিয়েছি জ্বাল;
সেই তারে হায়, দেখিয়া নারিনু খুলিয়া দেখাতে আমি
এই জীবনের যত হাহাকার উঠিয়াছে দিন-যামী,—
যে-আগুনে আমি জ্বলিয়া মরেছি, সে-দাবদাহন আনি'
কোন্ প্রাণে আমি নারী হয়ে সেই ফুলের তনুতে হানি'!
শুধু কহিলাম—পরাণ-বন্ধু, তুমি এলে মোর ঘরে,
আমি জানিনে কি ক'রে যে আজ তোমারে আদর করে!
বুকে যে তোমারে রাখিব, বন্ধু, বুকেতে শ্মশান জ্বলে;
নয়নে রাখিব! হায় রে অভাগা, ভাসিয়া যাইবি জলে!
কপালে রাখিব! এ ধরার গাঁয়ে আমার কপাল পোড়া;
মনে যে রাখিব, ভেঙে গেছে সে যে কভু নারে লাগে জোড়া!

সে কেবল শুধু ফ্যাল ফ্যাল ক'রে চাহিল আমার পানে ;
ও যেন আরে'ক দেশের মানুষ, বোঝে না ইহার মানে।
সামনে বসায়ে দেখিলাম তারে, দেখিলাম সেই মুখ !—
ভাবিলাম ওই সুমেরু হইতে কি ক'রে যে আসে দুখ।
দেখিতে দেখিতে সকাল কাটিল, দুপুরের উঁচু বেলা,
পশ্চিম দেশে গড়ায়ে পড়িল মেঘেতে আঁকিয়া খেলা।
বালুচর হ'তে বিদায় মাঙিল নতুন বকের সারি,
পাখায় পাখায় আকাশের বুকে শেফালীর ফুল নাড়ি'।

সে মোরে কহিল—"দিন চলে গেল, আমি তবে আজ আসি—"
—যার রাঙা মুখ ফুলের মতন, তাতে মাখা মিঠে হাসি—
সে মোরে কহিল, একটী কথায় ভাঙিল স্বপন মোর,
ভাঙিল তাহার সোণার চূড়াটী, ভাঙিল সকল দোর।
সে মোরে কহিল, "শোন তাপসিনী,আজিকের মত তবে
বিদায় হইনু, আবার আসিব মোর খুসী হ'বে যবে।"
হাসিয়াই তারে কহিলাম, "সখা, বিদায় নমস্কার !"
অভাগিনী আমি রুধিতে নারিনু নয়ন-জলের ধার।
খানিক যাইয়া ফিরিয়া চাহিল, কহিল আমারে, "নারী !
কোন কিছু ক'য়ে ব্যথা দেছি তোমা, কেন চোখে তব বারি ?"
আমি কহিলাম, "সুন্দর সখা, আমার নয়ন-ধার—
পাইয়াও যে গো পাইনে তোমারে—ভাষা এই বেদনার !"

"আমি কি নিঠুর"—সে মোরে শুধাল, আমি কহিলাম,—"নয় ;
ফুলেরও আঘাত পায়ে লাগে যার, কে তারে নিঠুর কয় ?
গলায় যাহার মালা দেই না ক' হয়ত মালার ভারে
তাহার কোমল ফুলের অঙ্গে কোন ব্যথা দিতে পারে।

ছুঁই না যাহারে ভয়ে
ও দেহ-তরুর অস্ফুট কুসুম যদি প'ড়ে যায় খ'য়ে।
সে মোরে দিয়েছে এই এত জ্বালা এ-কথা ভাবিব যবে
রোজ-কেয়ামত ভেঙে পড়ে যেন আমার মাথায় তবে!"
"তবে কেন কাঁদ? হায় তাপসিনী, জীবনের ভোরখানি!"
কার হেলা পেয়ে আজিকে এনেছ মরণের দেশে টানি'!"
আমি কহিলাম—"সোণার বন্ধু, এ-মোর ললাট-লেখা,
কেউ পারিবে না মুছাইয়া দিতে ইহার গভীর রেখা।
মাথার পসরাখানি
মাথায় লইয়া চলিতে হইবে সুমুখে চরণ টানি'।
এ-জীবনে কেউ দোসর হবে না, নিবে না করিয়া ভাগ,
এই বুক ভরি' জমায়েছি যত তীব্র বিষের দাগ।

তবু বলি সখা কেন কাঁদি আমি, তোমারে দেখিয়া মোর
কেন ব'য়ে যায় শাঙনের ধারা ভাঙিয়া নয়ন দোর।
আমি কাঁদি সখা, তুমি কেন হেথা মানুষ হইয়া এলে—
বিধির গড়া ত' সবই পাওয়া যায়, মানুষেরে নাহি মেলে।
আকাশ গড়েছে শ্যাম ঘন নীল, দুধের নবনী মেঘে—
সন্ধ্যা সকাল প্রতিদিন যায় নব নব রূপ মেখে;
যত দূরে যাই তত দূরে পাই, কেউ নাহি করে মানা,
কেউ নাহি পারে কাড়িয়া লইতে মাথার আকাশ খানা।
—বিধাতা গ'ড়েছে সুন্দর ধরা, কাননে কুসুম-কলি,
কোলে কোলে তার পাখী গাহে গান, গুঞ্জরে মধু অলি।
বাতাস চলেছে ফুল কুড়াইয়া পাখায় জড়ায়ে ঘ্রাণ—
যারে পায় তারে বিলাইয়া যায় ফুল-সখিদের দান।

তটিনী চলেছে গাহি—
তার জলে আজ সম-অধিকার, কারো কোন বাধা নাহি
শুধু মানুষেরে পায় না মানুষ, নাহি কারো অধিকার,
মানুষ সবারে পাইল এ-ভবে, মানুষ হ'ল না কার।

কেন তুমি সখা মানুষ হইলে, অতটুকু দেহ ভরি' !
বিশ্ব-জোড়া এ রূপ-পিপাসারে কেন রাখিয়াছ ধরি' !
আমি কাঁদি সখা কেন তুমি নাহি আকাশের মত হ'লে—
যেখানে যেতাম তোমারে পেতাম, দেখিতাম নানা ছলে
আকাশের তলে ঘর
যারা বাঁধিয়াছে তাদের তৃষ্ণা অমনি বিপুলতর।
তুমি কেন সখা কানন হ'লে না ফুলের সোহাগ পরি'—
রঙীন তোমার দেহ-নীপখানি পুলকে উঠিত ভরি' !
বাউল বাতাসে ভাসিয়া যেতাম তোমার ফুলের বনে,
অনন্ত তৃষা মিটায়ে দিতাম অনন্ত পাওয়া সনে।

কেন তুমি সখা মানুষ হইলে সীমারে বরণ করি'—
অসীম ক্ষুধারে সীমার বেড়ার বাহিরে রেখেছ ধরি' !
তুমি কেন সখা এমন হ'লে না—যত দূরে যাইতাম !
আকাশের মত যত দূরে চাহি' তোমারেই পাইতাম !
আমি অনন্ত আমি যে অসীম, অনন্ত মোর ক্ষুধা—
বিপুল এ-দেশে ভাসিতেছ তুমি একটু সীমার সুধা।
হায় রে মানুষ হায়
কেমন করিয়া পাব তারে, যারে ধরা-ছোঁয়া নাহি যায়

আমি কাঁদি কেন সুন্দর সখা তোমারে বলিব খুলি' ?—
এই বেদনায়, কেন তুমি এলে মানুষ হইয়া ভুলি' ?—
যে মানুষ এই ধরারে দেখিছে নীতির চশমা পরি'
যার যাহা পায় তাই লয় সে যে পালায় ওজন করি।
জগৎ জুড়িয়া পাতিয়াছে যারা মনুসংহিতা বই—
আমি কাঁদি সখা, আর কিছু নও তুমি সে মানুষ বই
জগতের মজা ভারি—
চোখ বেঁধে যারা ধরারে দেখিল তাহাদেরই নাম জারি।
বাহিরে হাসিছে নীতির জগৎ তাহার আড়ালে বসি,
কাঁদে উভরায় উলঙ্গ নর পরিশাসনের রসি।
সে বলে যে আমি না ভাল মন্দ আমি নর-নারায়ণ
মহাশক্তিরে বাঁধিয়া রেখেছে সংস্কার-বন্ধন।
আমি কাঁদি সখা, আমার মাঝারে আসে সে আমার আমি,
মোর সুখে-দুখে মন্দ-ভালোয় সুনাম-কুনামে নামি',
এ-জগতে কেউ চাহিল না তারে ; এ-মোর পসরাখানি
যারে দিতে যাই, সেই ফিরে চায় হেলায় নয়ন টানি'।
জগতের হাটে তাই—
সে মোর আমারে খণ্ড করিয়া দোকানে বিকায়ে যাই।
কেউ হাসি চায় কেউ ভালোবাসা, কেউ চায় মিঠে-কথা,
কেউ নিতে চায় নয়নের জল, কেউ চায় এর ব্যথা।
শস্যের ক্ষেতে একেলা কৃষাণ বীজ ছড়াইয়া যাই—
কোথা পাপ কোথা পুণ্য ছড়ানু, কোন কিছু মনে নাই।
আমি কাঁদি সখা, হাটে-বেচা সেই খণ্ড আমারে ল'য়ে
যারে ভালবাসি—তাহার পূজায় কেমনে আনিব ব'য়ে !
হায় হায় সখা, তুমি কেন হ'লে হাটের দোকানদার—
খণ্ড করিয়া চাহ যারে তুমি পূর্ণ চাহ না তার ?"

সব কথা মোর শুনে সে কেবল কহিল একটু হাসি'—
"মোর যত কথা ক'ব একদিন, আজকের মত আসি!"
পায়ে পায়ে পায়ে যতদূর গেল, নিমেষে রহিনু চেয়ে;
সন্ধ্যা-তিমিরে কলস ডুবা'ল সাঁঝের রঙীন মেয়ে।
শূন্য চরের মাতাল বাতাস রাতের কুহেলি-কেশ
নাড়িয়া নাড়িয়া হয়রাণ হ'য়ে ফিরিল ঊষার দেশ।

কত দিন গেল, কত রাত এলো, ঋতুর বসন পরি'
চলে কাল-নটী বরণে বরণে বরষের পথ ধরি'।
আজও বসে আছি এই বালুচরে, দু'হাত বাড়ায়ে ডাকি—
কাল সে আসিল এই বালুচরে, আর সে আসিবে নাকি?

প্রতিদান

আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর,
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।
যে মোরে করিল পথের বিবাগী ;—
পথে পথে আমি ফিরি তার লাগি ;
দীঘল রজনী তার তরে জাগি ঘুম যে হরেছে মোর ;
আমার এ ঘর ভাঙিয়াছে যেবা আমি বাঁধি তার ঘর।

আমার এ কূল ভাঙিয়াছে যেবা আমি তার কূল বাঁধি,
যে গেছে বুকেতে আঘাত হানিয়া তার লাগি আমি কাঁদি
সে মোরে দিয়েছে বিষে ভরা বাণ,
আমি দেই তারে বুকভরা গান ;
কাঁটা পেয়ে তারে ফুল করি দান সারাটি জনম ভর,—
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

মোর বুকে যেবা কবর বেঁধেছে আমি তার বুক ভরি’
রঙীন ফুলের সোহাগ-জড়ান ফুল-মালঞ্চ ধরি।
যে মুখে সে কহে নিঠুরিয়া বাণী,
আমি লয়ে সখি, তারি মুখখানি,
কত ঠাঁই হতে কত কিযে আনি, সাজাই নিরন্তর
আপন করিতে কাঁদিয়া বেড়াই যে মোরে করেছে পর।

পরাজয়

আগে ত জানিনি আমি
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটিবে আমার দিবসযামী।
ফুল তুলেছিনু মালা গাঁথিবারে ফুল-শর চাহি নাই—
ধূপ জ্বেলেছিনু গন্ধ শুকিতে, অগ্নিরে কেন পাই ?
কেন ভুজঙ্গ-জ্বালা
চন্দন বলে' কপালে লেপিতে কপাল হইল কালা !
কেন বারি মাগি তড়িৎ পাইনু, হায় পিপাসিত পাখি,
তোর তৃষ্ণার জলেতে আজিকে কে গেছে অনল রাখি !

কাঁটার পথেও চলিয়া দেখেছি কাঁটা লাগে নাই পায়,
ফুলের পথেতে চলিতে আজিকে আঘাত সহন দায়।
পাহাড় ভেঙেছি, কানন কেটেছি, বাজেরে লয়েছি শিরে,
ফুলের আঘাতে আজিকে সজনী হারানু পরাণটিরে।
আকাশ হইতে তারারে আনিয়া পরেছি তারার মালা,
পূর্ণ চাঁদের কলসী নাড়িয়া কুটির করেছি আলা।

দূর গ্রহপথে ভাসাইয়া দিয়া গানের আলোক-তরী,
কত ছায়া-পথে ছায়ারাণীদের লয়েছি বরণ করি।
কত ঝোড়োরাতে বাদলের সাথে মেঘেতে বাজায়ে ঢোল,
বিজলীর লতা আকাশে বাঁধিয়া খেলেছি আলোর দোল।
সেই আমি আজ তব ফুলবনে মানিলাম পরাজয়,
মাকড়ের আঁশে হাতিরে বাঁধিলে এই বড় বিস্ময়।

কবির সমাধি

[বনের ধারে নদীর তীরে কবির কুটির। একদিন মালিনীর মেয়ে মালতীলতিকার সাথে তার ভাব হয়ে গেল। প্রেমের প্রথম অভিনয় বেশ ভালই চল্‌ল। শেষে মালিনীর মেয়ের আর কবিকে ভাল লাগে না। কবির দুঃখ সে বুঝতে পারে না।]

মালিনীর মেয়ে আসে নাই কাল আজও নাই তা'র সাড়া,
ঘরে বসিয়াও কবির পরাণ হইয়াছে ঘর-ছাড়া।
দূর বালু-পথ অঘোরে ঘুমায় ধূলার বসন ধরে,
দখিনের বায়ু গড়াগড়ি যায় তাহার বুকের পরে।
তপ্ত বালুর মুকুরে ঢালিয়া বুকের আগুনরাশি,
দুপুরের রোদ গগন ঘিরিয়া হাসিছে বিকট হাসি।
আজো কি তাহার সময় হবে না, আজো এই নদী-তীর,
বালুর আখরে ছবি আঁকিবে না তাহার চরণটীর।
দূর দিগন্তে মেলি দুই বাহু ডাকে কবি, আয়—আয়—
এই নদী পথে সেই সুর যেন বালু হয়ে উড়ে যায়!

ক্রমে দিন যায়, সন্ধ্যার কোলে রক্তের জাল বুনি'
পশ্চিম তীরে হাসে খল-খল দিবস শেষের খুনী।
নদী-পথ বেয়ে পথিকেরা চলে, তাহাদের পদঘায়
কবির পরাণ ধূলায় মিশিয়া গুঁড়া হয়ে যেন যায়।
এই পথ দিয়ে কত লোক আসে, তার কি আসিতে নাই—
এ পথে কি কেউ কাঁটা গাড়িয়াছে সে আসিবে বলে তাই ?
দূর পশ্চিমে এখনো হাসিছে দিক্-বলয়ের মালা,
পল্লী-বধূরা প্রদীপ জ্বালায়ে তাহাতে করেছে আলা।

সেই কালে কবি হেরিল সমুখে, আসে মালিনীর মেয়ে,
এলো চুল হ'তে শিথিল কুসুম পড়িতেছে পথ বেয়ে ;
দুটী বাহু তা'র হেলিছে দুলিছে, উড়িছে সুনীল শাড়ী,
অঙ্গে-অঙ্গে বাজিছে গহনা সারা দেহ তা'র নাড়ি।
—এমনি করিয়া মেঘ-পথ বেয়ে হাসে বিজলীর লতা,
—কহে কাল জলে ডুবিতে ডুবিতে সোনার কলসী কথা !
কবি শুধু তা'রে চাহিয়া দেখিল, যেন দুটি আঁখি ভরি,
সারা দেহে তা'র যত রূপ আছে লইল উজাড় করি।
মালিনীর মেয়ে হাসি-মুখে তা'র আরও মাখাইল হাসি—
কহিল, "আজিকে দেরী করে দিল রাজার কুমার আসি'।
কালিকেও আমি সাজিয়া গুজিয়া আসিব তোমার কাছে—
এমন সময় রাজার কুমার ডাক দিল মোরে পাছে।

সেকি ছাড়ে মোরে—দিতে হ'বে তারে বিনা-সুতে গেঁথে মালা,
এমনো নয়কো তেমনো নয়কো সে এক বিষম জ্বালা !

খানিক তাহার পাটল ফুলের, খানিক বকুল ফুল ;
তার মাঝে মাঝে গোলাপ গাঁথিতে নাহি হয় যেন ভুল।
সে মালায় পুনঃ লিখিতে হইবে রাজার ছেলের নাম—
কি করিব আমি, সারা রাত জেগে তাই শুধু গাঁথিলাম।
আজ এসেছিল মালা লইবারে—পেয়ে সে কি খুসী তা'র !
বলে সে এমন বিনা-সুতী মালা কভু দেখে নাই আর।
তাহার গলার গজমতি হার আমারে দিয়েছে ডেকে
তোমারে দেখাতে আসিলাম তাই এই সাঁঝে ঘর থেকে।
এখনই আমারে ফিরে যেতে হবে, আজিকে নূতন করে—
সারা রাত জেগে রাজার ছেলের মালা দিতে হবে গ'ড়ে।"
কবি কহে, "শুন মালিনীর মেয়ে, আমিও গেঁথেছি মালা,
কথায়-কথায় সূত্র গাঁথিয়া তোমারে পরাতে বালা !
যে কথা আমার গোপন মনের আঁধার গুহার কোণে,
হাজার বরষ ঘুমাইয়াছিল নিশার স্বপন-সনে—
আজিকে বে-বুঝ বেদনার ঘায়ে সে কথারে ছিঁড়ে আনি
আঁখি যমুনার কাল জলে ধুয়ে গেঁথেছি মাল্যখানি।"
মালিনীর মেয়ে হাসিয়া কহিল—"এ সব ত শুনিলাম,
আচ্ছা বলত তোমার মালায় লিখিয়াছ কার নাম ?"

কবি কহে "সখি, কি লিখেছি আমি তোমারে বলিব খুলে,
আকাশেতে হাসে আকাশের তারা ধরায় নামে কি ভুলে ?
ঊষার কিরণ তড়িতের সিঁথি ভুলিয়া গিয়াছি তাই—
মালিনীর মেয়ে মালতী লতিকা তারও নাম লিখি নাই।
এ মালায় আমি লিখিয়া রেখেছি তোমার ও রাঙা মুখ,
এই ধরণীর মানুষের মনে দিতে পারে যত দুখ !

ও দেহ তরণী বাহিয়া চলেছ মোদের নদীর জলে
আঘাতে তাহার যত ঢেউ উঠে মালায় লিখেছি ছলে।
আর লিখিয়াছি ওই ভাঙা ঘরে তোমার কথাটি স্মরি,
রাতের তারারে সাক্ষ্য মানিয়া জাগিয়াছি বিভাবরি ;
অজানা গ্রহের দূর পথ বেয়ে চলে গেছে মুসাফির,
তারা দেখে গেছে কি বেদনা মোর একেলা পরাণটীর।
সেই সব আমি মালায় লিখেছি আরও লিখিয়াছি তাতে —
আরও যে আঘাত হেনে যাবে তুমি আমার জীবন পাতে।”

“এ মালায় মোর কি হইবে কাজ ?” মালিনীর মেয়ে কয়,
কবি কহে, “সখি, বেদনার দান জগতে যে অক্ষয় !
তুমি কি জান না তোমার বিধাতা তোমারে পাঠাল ভবে
এই কথা বলে—ও দেহের রূপে জগৎ জিনিতে হবে।
তোমার গলায় মোর মালাখানি এ যে তব জয়-হার,
ও রূপে তোমার কত মোহ আছে, ভাষা এ যে সখি তার।
মোর মালাখানি লয়ে যাও সখি ! মহাকাল নদীজলে—
রূপের তরণী করে টলমল ঘটনার হিল্লোলে।
ওই তব হাসি ওই রাঙা মুখ, ও যেন সোতের পানা,
আজ যারে দেখি কালিকে তাহারে অমনি দেখিতে মানা।
আমি যেন আজ দেখিতেছি সখি, তোমার ও রূপখানি
তটিনীর মত ছুটিয়া চলেছে কূলে কূলে ব্যথা হানি।
ও তব সোনার কান্তি জুড়িয়া নাচিছে কালের ঢেউ,
আজ যারে দেখি কালিকে তাহারে হেন দেখিবে না কেউ
কি জানি যদি বা এই কভু হয়, ও তব সুষমাখানি
বরষের কোন দৈত্য আসিয়া লয়ে যায় কোথা টানি।

তখন সজনী দেহ-বালুচরে খুলিয়া আমার মালা
দেখিও যা তুমি হারায়েছ পথে—কত সে হানিত জ্বালা।
ও-দেহের সেই ভগ্ন দেউলে এ মোর মাল্যখানি
বিগত দিনের কত ভোলা কথা আনিবে সেদিন টানি।
তখন যদি বা এই অভাগারে পড়ে যায় তব মনে,
ফেলিও সজনী, এক ফোঁটা জল ও তুটি নয়ন-কোণে।
এই আশা লয়ে আজো বেঁচে আছি বুকে করাঘাত হানি;
ভাবি—নখে নখে ছেঁড়া যায় নাকি গোপন বেদনাখানি।"

মালিনীর মেয়ে শুধাইল, "কবি বুঝাইয়া বল মোরে
শুধু কি বেদনা রাখিয়াছ আজ তোমার মালায় ভ'রে?"
"শুধুই বেদনা"—কবি কহে কেঁদে, "নিছক বেদনা সখি,
এ পোড়া নয়নে আর কিছু নয় বেদনারে শুধু লখি।"
"কেন ব্যথা পাও" মালিনীর মেয়ে কহে আরও কাছে এসে,
কবি কহে "সখি, ললাটের লেখা এ যে তোমা ভালবেসে।
এ জীবনে যারে ভালবাসি সেই সব চেয়ে দেয় দাগা,
ভাগ্য যাহারে সঁপিলাম সেই বানাইল তুর্ভাগা।
ভরা তরী যারে দিলাম যাচিয়া, সে নিঠুর মোরে আজি—
ধরণীর গাঙে সাজাইয়া দিল শূন্য নায়ের মাঝি।"
"কেন, আমি তব কি করেছি কবি" সুধায় মালীর মেয়ে,
কবি কহে, "কেন তড়িৎ হইয়া এলে মোর মেঘ বেয়ে?
দেশে দেশে আজ গুমরি কাঁদিয়া তোমারে খুঁজিয়া মরি,
তীব্র ব্যথার আগুন জ্বালিছ মোর বুকখানি ভরি।
ধরিতে ধরিতে পলাইয়া যাও, বাহুর বাঁধন হায়—
এত যে শিথিল, ভালবাসিবার আগে যদি জানা যায়!

যদি জানা যায়—যারে কাছে চাই সেই হয়ে যায় দূর,
তবে কেহ কভু কারো কথা দিয়ে বাঁধিত গানের সুর ?
এ মোর নিখিলে এ ব্যথারে সখি জুড়াবার নাহি ঠাঁই
যারে ভালবাসি সেই দিল মোরে সব চেয়ে বেদনা-ই !
তাই দিয়ে আমি গাঁথিয়াছি মালা, তারি আঁকিয়াছি ছবি,
গজমতি হার কোথা পাব সখি, আমি যে তোমার কবি !”
“হায় হতভাগা” মালিনীর মেয়ে কহে তার হাত ধরি,
“যে ব্যথারে আমি চিনিনে এ ভবে তারে লয়ে কিবা করি ।
মালিনীর মেয়ে, ফুল লয়ে খেলি, ফুলে-ফুলে গাঁথি হার ;
ফুলের দেশে ত হাসি আছে সখা, বেদনা নাই যে তার !
মোর ফুল-বনে ফুল বিছাইয়া ঘুমাই ফুলের গায়,
সন্ধ্যা-সকালে কবরী এলায়ে গন্ধ ছড়াই বায় ।
ফুলের সঙ্গে শিখিয়াছি সখা কেবলি ফুলের হাসি,
সে দেশে আজিকে কেমনে লইব তোমার ব্যথার বাঁশী ।
এ জীবনখানি মদের পেয়ালা দোলে তরঙ্গ ভরে ;
লহরে লহরে সোণার স্বপন ভেসে ওঠে থরে থরে ।
এরি সাথে যারা মনের বীণাতে বাঁধিতে পারে না সুর,
চরণের ঘায়ে তাহাদের মোরা ছিটাইয়া দেই দূর ।”
কবি কহে, “ওগো ফুলের কুমারী, ফুল লয়ে তুমি থাকো,
সে ফুল যে সখি, ঝরে পড়ে যায় তারে তুমি দেখ নাকো ?
ফুলের হাসি যে দুদিনে শুকায় ফোটা ফুল হয় বাসি —
এই কথা স্মরি তোমাদের দেশে বাজে নাই কোন বাঁশী ?
যে ফুল তোমরা অলকে বাঁধিছ যে ফুলে গাঁথিছ হার,
তোমাদের দেশে কোন গান নাই সে ফুলের বেদনার ?”
“নয়, নয়, নয়,” মালিনীর মেয়ে কহে পুনরায় হাসি,
প্রতিদিন মোরা ঝাঁটাইয়া দেই পথে ঝরাফুলরাশি ।

আমাদের দেশে শুধু হাসি সখা—যার ক্রন্দন থাকে,
পথের ধূলায় দলিয়া আমরা পায়ে পিষে যাই তাকে।"

"তবু—তবু—ওগো সোণার বরণী আমারে করুণা করি
মাঝে মাঝে শুধু দেখে যেয়ো মোরে ব্যথায় যদি না মরি!"
"সময় কোথায়?" মালিনী শুধায়, চলিছে ভাটীর বেলা—
এরি মাঝে সখা, সেরে নিতে হবে জীবন-নাটের খেলা!"

কারে অভিমান

কারে অভিমান হায়রে পরাণ জীবনের সাহারায়,
কারো ব্যথা কেউ ভাবিয়া দেখিতে সময় নাহিক পায়।
যার পাছে পাছে ফিরিলি কাঁদিয়া,
সে ত কভু তোরে দেখে না চাহিয়া ;
শুধু মিছে গান গাঁথিয়া গাঁথিয়া, বাড়ালি বুকের জ্বালা ;
আপনারি হাতে গাঁথিয়া পরিলি দহন-নাগের মালা।

পরের পরাণ লইয়া উহারা করিতেছে ছেলেখেলা,
ভালবাসা-বাসি উহাদের কাছে আপন হাতের ঢেলা।
ওরা জানে রাঙা মুখের মায়ায়,
নিখিল ধরারে পায়ে দলা যায় ;
তোর অভিমান, কিবা আসে তায়,—তোরি মত শত শত
ওদের একটু কৃপার লাগিয়া পথে পড়ে আছে কত।

জীবনের দাম উহাদের কাছে একটু শুষ্ক হাসি,
একটু চাহনি—তারি বিনিময়ে ভালবাসা রাশি রাশি।
একটু করুণা, একটু আদর,
ওরা জানে তার কতটা কদর ;
মানুষেরে লয়ে নাচায় বাঁদর, ওরা তার বিনিময়ে ;
ছিনিমিনি খেলা করিতেছে নিতি পরের পরাণ লয়ে।

উহাদের হাটে উহারাই রাজা, নিয়ম তাহার এই,
বিনামূলে যাহা বিকাইতে পার,—কিনিতে ক্ষমতা নেই।
যদিই কখনো করুণা করিয়া,
কারো কাছে কিছু ফেলে বা বেচিয়া ;
হাতে না লইতে যায় তা ভাঙিয়া, দুধের ফেনার মত,
বাহিরে তাহারে যতটা দেখায় আসিলে নয়কো তত।

হাটেতে উহারা বেসাতী করিছে বেলোয়ারী চুড়ী লয়ে,
ক্রেতারা আসিয়া ভীড় করিয়াছে মাণিকের বোঝা বয়ে।
একটু সে কথা, "আমি ভালবাসি,"
তারি মোহে গেছে কত প্রাণ ভাসি,
মুকুতা রতন কত রাশি রাশি, পড়েছে চরণ তলে ;
ওরা যা দিয়েছে কর্পূর মালা, ধরিতেই গেছে গলে।

কাজ নাই তোর—কাজ নাই ওরে,এ হাটে দোকান বাঁধি,
মিছে কেন আর কাঁদিয়া বেড়াস মানুষেরে মন সাধি ?
এমন পাগল কে আছে কোথায়
নদী-সোঁত সনে মিতালী পাতায় ?—
মানুষের মন তারো বেগে ধায় ; পিছু ডাক নাহি শোনে।
—কভু কি কোথায় পিরীতি করেছে মানুষে মানুষ সনে ?

তবু যে তাহারে ভুলিতে পারিনে আয় তবে মাটি লয়ে,
তারি মত এক মাটির মানুষ গড়ে লই দেবালয়ে ;
মাটির দেবতা লবে পূজাভার
নাই যদি লয়, হেলা নাই তার ;
আসিবে না কভু পায়ে দলিবার, জীবনেরে অকাতরে
মাটির মানুষ গড়িয়া তাহারে পূজিব মাটির ঘরে।

হায়রে পরাণ—মাটির পরাণ। কোথায় জুড়াবি দুখ,
এমন দরদী কোথা কিরে নাই স্নেহে ভরা যার বুক ;
আকাশে বাতাসে হেন কোন ঠাঁই,
পথের দোসর কেহ কিরে নাই ;
এত ভালবাসা কারে দিয়ে যাই—কারে গলাগলি ধরি,
শূন্য বেনুর এতগুলি ফাঁক গানে গানে দিই ভরি।

তোমারে ভুলেছি আজ

তোমারে ভুলেছি আজ—
সারাদিন বসি' তোমারে ভাবিব, ভারি ত প'ড়েছে কাজ !
সকালে উঠিয়া বেড়াইতে যাই, নদীটির তীরে যাই—
সেইখানে তুমি নিতুই আসিতে, হাসি যে থামে না ছাই !
সেই কবে তুমি রাঙা পাও মেলে এসেছিলে নদীতীরে ;
সে পায়ের রেখা কবে মুছে গেছে ভরা বরষার নীরে ;
সেথা যে এখন ঘন কাশবন, তুমি ভাবিয়াছ বুঝি,
সেই কাশবন দুহাতে সরায়ে তব পা'র রেখা খুঁজি ।
বালাই প'ড়েছে, আমি সেথা রোজ এমনি বেড়াতে আসি,
কাশের পাতায় শিশির জড়ান, তাতে রোদ যায় ভাসি ।
প্রথম রবির সিঁদুরিয়া রোদ, তোমার রঙীন ঠোঁটে,
কতদিন আমি দেখেছি ওমনি রাঙা রাঙা হাসি ফোটে ।
তাই ব'লে আমি তোমারে ভাবিনে, কাশের ক্ষেতের পরে
কাঁচা-পাকা ধান অঝোরে ঘুমায় দেখিও স্মরণ ক'রে ।

সারারাত তারা স্বপন দেখেছে, জোছনায় গাও মেলি'
বক্ষে তাদের রাতের শিশির স্বেচ্ছায় গেছে খেলি ।

তোমারি গায়ের রঙখানি যেন সেই ধানক্ষেতে পাতা ;
তাই বুঝি আমি সেইখানে যাই ? এমনি হয়েছি যা-তা !
সেইখানে বসি' দুধালি লতায় কলমীর ফুল বাঁধি—
আজো মনে আছে, কবে দিয়েছিনু তোমার গলায় সাধি !
আজো মনে আছে—সেই কবে তুমি মঞ্জরী-ধান তুলি,
কানে পরেছিলে হাতে বেঁধেছিলে দু-একটি তার ভুলি !
আজো কি আমার স্মরণে রয়েছে বলেছিনু সেই কবে,
'এমন সাঁঝেতে যে দেখিবে তোমা, কৃষাণের রাণী কবে।'

ভুল—ভুল সখি, ও সব ভাবার অবসর নাহি আর,
পারিনে এখন সময় কাটাতে কথা লয়ে যার-তার,
বিকালে কেবল বেড়াইতে যাই—নদীর তীরেই যাই,
সেখানেতে বুঝি তুমি ছাড়া আর কেহ কভু আসে নাই ?
সেই পথ দিয়ে কত লোক চলে—সেই চলা-পথ ধ'রে,
চলে মহাকাল দিন-রজনীর আলো-ছায়া পাখা ভরে।
চলে কত রবি, চলে কত চাঁদ—চলে শত গ্রহ তারা,
রেখা-লেখাহীন অনামিক পথে হইয়া আপনহারা।
দিন-বলাকার বলয় ঘিরিয়া নির্ম্মম পথ-নাগ,
ঘুমায়েছে আজো—গাঁয়ে পরিল না কাহারো পায়ের দাগ।

সেই পথ দিয়ে তুমি এসেছিলে, ফুলতনু রথখানি
উড়ায়ে যাইতে ভাবিয়াছ সেথা গেছ ফুলরেখা টানি !'
ভাবিয়াছ, তব গায়ের গন্ধ উড়েছিল বায়ুভরে ;
সবটুকু তার রাখিয়াছি আমি বুকের আঁচলে ধরে।

—আজো সে গন্ধ ছড়াইয়া দিয়ে সাঁঝের উতল বায়
এই বালুচরে একেলা আমার সময় কাটিয়া যায় !
মিথ্যা সজনী—মিথ্যা এ সব, নিজেরেই লয়ে মরি,
নিজেরেই মোর সামলান দায় পরেরে কখন্ স্মরি ?

দূর পশ্চিম গগনের কোলে নানান মেঘের মেলা
তারি 'পরে বসে নানান বরণ রৌদ্রের হাসিখেলা,
সে হাসি আবার ঝরিয়া পড়েছে কতক নদীর জলে,
নদী ও আকাশ লালে লাল হাসে ধরিয়া এ-ওর গলে।
তুমি ভাবিয়াছ সেথায় পাতিয়া রঙের ইন্দ্রজাল,
তোমারে ধরিতে রোজ সন্ধ্যায় একেলা কাটাই কাল।

তুমি বুঝি ভাব ওই যেখানেতে দুলিতেছে ঝাউবন,
সেখানে বসিয়া কত কি ভাবিয়া কাঁদি আমি সারা খন।
আমি বুঝি ভাবি সেই কবে তুমি ধরিয়া আমার কর
বলেছিলে, "এই ভালবাসা মোরা রাখিব জনম ভর।"
কাশের পাতায় মোর হাতখানি বাঁধিয়া তোমার হাতে
"এই বন্ধন অটুট রহিবে" বলেছিলে নিরালাতে।
আরো বলেছিলে, "এই কাশপাতা যদি-বা ছিঁড়িয়া যায়
মনের বাঁধন মনেই রহিল টুটিতে দেব না তায়।"
আমি বলেছিনু,—"সোনার বন্ধু, বড় ভয় করে মোর
প্রণয়ের রাতি ঘুম না ভাঙিতে হয়ে যায় যে গো ভোর।
শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেই থাকে, রজনী যে হয় বাসি
এদেশে যে সখি বাসরের রাতে বাজে বিদায়ের বাঁশী।"

তুমি বলেছিলে, "যদি-বা কখনো রজনী পোহাতে চায়
এ দুটি কোমল বাহুর বাঁধনে ফিরায়ে আনিব তায়।
আমি কয়েছিনু, "শোন গো সজনী, কাঁদে মোর ভীরু হিয়া,
বড় ভয় করে যদি বা তোমারে আর কেহ যায় নিয়া।
পদে পদে মোর কত অপরাধ, হয় ত মনের ভুলে
যদি কোনদিন এ ফুলতনুতে কোনো ব্যথা দিই তুলে,
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে ? শোন ওগো মনোরমা,
সেদিনের সেই অপরাধ হ'তে করিবে আমারে ক্ষমা ?
তুমি সুন্দর, জগত জুড়িয়া পূজামন্দির পাতি'
মন্ত্রে মন্ত্রে ডাকিতেছে তোমা পূজারীরা দিবারাতি।
মোর এই গেহে ক্ষুদ্রের পূজা, বাতাসে ভাসিয়া হায়,
যদি কোনোদিন আর কোনো গান লাগে এসে তব গায়,
এ মোর গেহের নানান ছিদ্র যদি তারি পথ বেয়ে
আর কোনো কারো গান ভেসে আসে কাহারো প্রণয়ে নেয়ে ?
তখন কি তুমি মোরে ছেড়ে যাবে ?" তুমি বলেছিলে হায়,
অলীক ভয়ের দেউল গাঁথিয়া ঠকায়ো না আপনায়।
তোমার ঘরের যত ফাঁক আমি বুকের আঁচল চিরে
এমনি করিয়া বাঁধিয়া রাখিব মায়ামমতায় ঘিরে !
আর কারো গান পশিবে না হেথা, শুধু তুমি আর আমি,
তার সাথে সাথে রহিবে সাক্ষ্য দীর্ঘ দিবস যামী।
তুমি ভাবিয়াছ সেদিনের সেই তরুণ তৃণের মাঠ
এই-সব কথা বক্ষে লিখিয়া আজিও করিছে পাঠ !
সেদিনের সেই শুক্‌নো নদীরে সাক্ষ্য মানিয়া হায়,
এমনি যে সব শুনেছিনু কথা বসিয়া তোমার ঠাঁয়।
—আজিকার নদী সে নদী ত নাই, যদিও বরষা শেষ
তবু এর বুকে লেখা নেই সখি সে সবের কোনো লেশ।

সেদিনও এমনি দুলেছিল সখি শূন্যের নীল মায়া
—তব এ আকাশ সে আকাশ নয়, এর বুকে মেঘছায়া।
সেদিনও এমনি বিভোল বাতাস,—আজিকার মত নয়
—এ যেন কি ব্যথা সহিতে না পেরে কাঁদিছে ভুবনময়।
এই বালুচর,—একি সেদিনের? হায় হায় সখি হায়,
কি ব্যথারে এ যে গুঁড়ো করে আজি উড়িছে উতল বায়।
এরা কেউ তার সাক্ষ্য হবে না—নাই তারো প্রয়োজন
তুমি যদি মোরে ভুলে গেলে সখি, মোর ভোলা কতখন।

তোমারে স্মরিয়া কাঁদিতেছি আমি, চোখে পোকা লাগিয়াছে
তাই এত জল, প্রত্যয় নাহি শুধাও না কারো কাছে?
ফুলে পোকা লাগে, বুকে পোকা লাগে—লাগে ভালবাসা মাঝে,
এ তবে এমন বিস্ময় কিবা চোখে যদি পোকা রাজে?
তোমারে আজিকে ভুলে গেছি আমি, বক্ষে নখর হানি'
ভাবিতেছি হায় ছেঁড়া যায় নাকি ব্যথাভরা মনখানি!
সারা দেহে আমি বালু মাখিতেছি, বালুর কঠোর ঘায়,
দেখি যদি এই জীবন হইতে কারো স্মৃতি মোছা যায়।
রাতের কালিরে মুঠি মুঠি ধরে সারা গায়ে বসে মাখি,
মনে হয় এরি কুহেলী মায়ায় বেদনারে ঘিরে রাখি।

তুমি ভাবিয়াছ তোমারে ভাবিয়া রাতে ঘুম নাই মোর,
শিয়রে প্রদীপ জ্বলিতেই থাকে আমার হয় না ভোর।
মিথ্যা এসব—কলাবন ধরি রাতের বাতাস কাঁদে,
বাঁকাচাঁদ তারে ধরিবারে চায় জোছনার মায়া ফাঁদে।

রাতের বিরহী ঝিঁঝিরা বাজায় বে-ঘুম বুকের কথা,
তারি সাথে যেন ডাক ছেড়ে কাঁদে—এ মূক মাটির ব্যথা।
তারি সাথে সাথে গান ভেসে আসে কবরের মাটি ফাঁড়ি,
সেই সুরে সুরে আমিও আমার বুকের ব্যথারে ছাড়ি।
এই ধরণীর কঠোর মাটির মহা-ভার বুকে নিয়ে,
অনন্তকাল এ মাটির সনে কেঁদেছে যাদের হিয়ে
সেই সব মৃত সাথীদের সনে গলাগলি ধরি রোজ,
আরো অভিনব তীব্র ব্যথার একা আমি করি খোঁজ।
তাই রাত কাটে। আমি আছি আর আছে মোর এই ব্যথা
নাই—নাই আর অবসর নাই, ভাবিতে কাহারো কথা।

চিঠিগুলি তব বাক্সে ভরেছি। আঁটিয়াছি চাবি তালা,
তবু ভয় হয় পাছে বা তাহারা খুলে বাহিরায় ডালা।
বারে বারে তাই খুলে খুলে দেখি পড়ে দেখি বার বার
যদি কোনো কথা কোনো ফাঁক দিয়ে হয়ে আসে কভু বার,
কাপড় জড়ায়ে বাক্সেরে ঢাকি যদি তারা কোনো ফাঁকে
ভালবাসি আমি, হেন কোনো কথা মনে এসে রেখা আঁকে!

তুমি লিখেছিলে, চিঠির আখরে তুমি লিখেছিলে মোরে,
"পরাণবন্ধু, তোমারো ব্যথায় আমারো পরাণ ঝরে।"
আরও লিখেছিলে, "তুমি যদি সখা আমারে স্মরণ করি
এমনি করিয়া কাঁদিয়া কাটাও সারাটি জনম ভরি।
তোমার গেহেতে যে প্রদীপ আজি জাগিয়া কাটায় রাতি
তারে ব'লে দিও মোর গেহে হেন জ্বলিছে বে-ঘুম বাতি।
আরও লিখেছিলে, "যে প্রদীপ আজি বুকের ব্যথারে জ্বালি'
তিলে তিলে হায় নিজেরে ধরিয়া আগুনে দিতেছে ঢালি'!

তার জ্বালা দেখে পতঙ্গ সেও মরণ বরণ করে,
আমি ত মানুষ. তোমার ব্যথায় কি করে রহিব ঘরে !
আমি ভাবিতেছি এই-সব কথা যদি আজ পাখা মেলি’
বাক্সের কোনো ছিদ্র বাহিয়া বাহিরেতে আসে ঠেলি !
—তাই বারে বারে তালা চাবি দিয়ে বেঁধেছি বাক্সটারে
এর কোনো কথা আর যেন কভু বাহিরে আসিতে নারে ।

খুলিয়া খুলিয়া চিঠিগুলি পড়ি, যদি বা হঠাৎ করে,
এ সব কথার এক আধটি বা উড়ে যায় হাওয়াভরে !
তাই বারে বারে চিঠিতে আঁকিয়া রক্তকালির রেখা
কাগজের সাথে ভাল করে বাঁধি—তোমার সে-সব লেখা ।
তুমি ভাবিও না, সাক্ষ্য মানিয়া চিঠির কয়টি পাতা
সারারাত আমি ভুল বকিতেছি আপনার মনে যা-তা,
—আমি তাহাদের লুকাইতে চাই যেন কভু কোনোমতে
সেই বিস্মৃত দেশ হ’তে তারা পারে না বাহির হ’তে ।
ভাবিও না তুমি সময়ের মোর হইয়াছে বাড়াবাড়ি,
প্রমাণ করিব চিঠিতে যা তুমি মিথ্যা করেছ জারি ।
অবসর নেই । তুমি ভুলে গেছ আমিও ভুলিতে পারি ;
—আমার দিবস রজনী কাটিছে ভুল গেঁথে সারি সারি ।

তুমি ভুলে গেছ, হয়ত তেমনি কাটিছে তোমার বেলা
আলসে এলায়ে কবরী হেলায়ে পাতিছ রূপের খেলা ।
হয়ত অধরে আজিও আঁকিছ তেমনি সুঠাম হাসি
সোনা তনু বেয়ে পথে পথে তারি ছড়াইছে রাশি রাশি,
হয়ত সে মুখ আজো উচ্চারে, ভালবাসাবাসি কথা,
হয়ত তাহাই জড়ায়ে হাসিছে কত পরিণয়-লতা !

এ সব তোমারে শুধাব না আমি, অবসর নাহি মোর—
ভুলিয়া ভুলিয়া করিব যে আমি জীবন-আয়ুর ভোর !
তোমারে ভুলিব—যে আলো জ্বলিয়া স্মৃতিরে বাঁচায়ে রাখে
আজিকে তাহারে রাখিয়া যাইব জীবনের পথবাঁকে—
সুমুখে এখন নাচিবে আমার মরণের আঁধিয়ার,
আমি তার মাঝে বসিয়া গাঁথিব কেবলি ভুলের হার !

দুরাশা

শূন্য নদীর কূলে
আমার বেদনা দুটী তট বেড়ি কাঁদিতেছে ফুলে ফুলে।
উতল বাতাস পাখা নাড়িতেছে ব্যাকুল বেণুর শাখে,
কাশবন আজি গড়াগড়ি যায় সারা গায়ে ধূলি মাখে।
গগন-রেখার চক্র ধরিয়া বৃথা কাঁদে দূর বন,
সেই নির্ম্মম কভু পরিল না সবুরের বন্ধন।
মিছে ঘুরে মরে চরের বিহগ শূন্যে বাঁধিয়া ডানা,
সে দূর আজিও পাখার বাসরে আনেনি আকাশ খানা।
বৃথা কেঁদে মরে মাটীর ধরায় সবুজের আলপনা
কোমল বাহুর বাঁধন তাহার আজো কেউ পরিল না।

বিদায়

আজিকে আকাশে মেঘ-মেঘ যেন, বাতাস বহিছে ধীরে,
এসগো সজনী মোরা দুইজনে বসিগে নদীর তীরে।
ছোট গেঁয়ো নদী, দুইধারে লিখি নতুন ধানের লেখা,
কল-ঢেউ সনে পড়িয়া চলেছে বুকে আঁকি তারি রেখা।
চখা আর চখী গলাগলি ধরি ফিরিছে বালুর চরে,
বাতাস দুলিছে তারি সাথে সাথে ধূলার বসন ধরে।
দূর পশ্চিমে হেলিয়া পড়েছে অলস দিনের বেলা,
মেঘে আর রঙে, রঙে আর মেঘে করে মেঘ-রঙ্-খেলা।
কুন্দ ফুলের মালাগাছি আজ উড়ায়ে গগন-গায়,
চরের পাখীরা ফিরিয়া চলেছে সুদূর নীড়ের ছায়।
দিগন্ত-জোড়া দূর বালুচর, নিজ্ঝুম নিরালায়,
তাহার উপরে অলস দিনের আলো-ধারা মুরছায়।
থাকিয়া থাকিয়া চরের বিহগ উঠিতেছে ডাকি ডাকি,
এ মূক চরের বেদনারে সে যে ভাষায় বাঁধিছে নাকি ?
দূরে আলো-জ্বালা কলাবনছায়ে কৃষাণের ঘরগুলি,
রহিয়া রহিয়া উঠিতেছে যেন মৃদু কোলাহলে দুলি।

এসগো সজনী এইখানে বসি মুখোমুখি দুই জনা,
এ উহার পানে শুধু চেয়ে রব, কোন কথা বলিব না।
তোমার অধরে পড়িবে ঢলিয়া অলস দিনের আলো
আমার মুখেতে কুহেলী রাতের আঁধিয়ার কালো কালো।
আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে, তুমি মোর মুখ পানে,
মাঝে অনন্ত কথার সাগর কথা কবে কানে কানে।—
আমি চেয়ে রব তব মুখ পানে—রাঙা তব মুখখানি
মুঠি মুঠি ধরি সন্ধ্যার আলো তাহাতে ছড়াব আনি।
আকাশ হইতে তারা ফুল ছিড়ে বাঁধিব তোমার কেশে
সাঁঝ-মাখা ওই আধা গাঙ্-খানি জড়াইব তব বেশে।

আজিকে সজনী কেহ নাই হেথা, শুধু আমি আর তুমি
উপরে আকাশ নীচেতে সবুজ তৃণ ঘেরা বালুভূমি।
এইখানে আজি বসিয়া সজনী তব মুখপানে চেয়ে,
দেখিতেছি যেন কত মেঘ নাচে অতীত গগন ছেয়ে।
আজি মনে পড়ে সেই কোনদিনে কিশোরী বালিকা বেশে,
এসেছিলে তুমি এই বালুচরে রাঙা মুখে মৃদু হেসে।
কুন্তলে তুমি জড়াইয়াছিলে নবীন ধানের ছড়া,
হাতে বেঁধেছিলে জন্তীর ফুল কাঁখেতে মাটির ঘড়া!
তৃণ পথে যেতে দুপায়ের খাড়ু খুলে যায় বারে বারে,
কাঁখের ঘড়াটি মাটিতে নামায়ে পরিতে আবার তারে;
আপনি কুপিয়া খাড়ুরে শাসাতে, পথেরে পাড়িবে গালি।
আমি ভাবিতাম, ভুরু-ধনু বুঝি ভেঙে যায় খালি খালি।
সেদিন আমারো কিশোর বয়স, দেখিয়া সে মায়া-ছবি,
আমি সাজিলাম পথের বাউল তোমার গাঁয়ের কবি।

আমার বাঁশীর সুরে

সেদিনের সেই কৃষাণ কুমারী ফিরিল গগন জুড়ে ;
দূর মেঘ-পথে যেখানেতে সাজে চাঁদের কনক-রথ
আমি বাঁশী সুরে সেদেশেতে তার গড়েছি সোনার পথ।
সেই পথ বেয়ে চলিত সে মেয়ে, চাঁদ-মাখা গায়ে তার
রাতের নীহার পরাইয়া যেতো মণি মাণিকের হার।
তুখানি চরণ জড়ায়ে পড়িত রেশমের মত মেঘে ;
সে মেঘ আবার গুঁড়ো হয়ে যেতো বিজলীর আলো লেগে
চলিত সে মেয়ে, চলিত সে তার রেখা-লেখা পথ ছাড়ি
যেখানে অথই নীল পারাবার গগন-গাঙের পাড়ি,
সেখানে সে এসে ঘুমায়ে পড়িত আলু-থালু কেশ-পাশ
বাতাস তাহার অধরে মাখাত মন্দার-ফুল-বাস।
সমুখে তাহার ভিড়িত আসিয়া বরণে বরণে সাঁঝ,
বরণে বরণে আসিত উষসী মাখিয়া সিঁদুর সাজ।
নাচিত সেখানে শত মধুমাস কোকিলের সুরে সুরে,
গোলাপ তাহারে শুনাইত গান বুলবুলি ঠোঁটে পুরে।

এমনি করিয়া কত দিন তারে দেখেছি কত না মতে
নিয়ে গেছি তারে কত নব দেশে কত নব দেশ হ'তে !
আমি ভাবিতেছি সোণার বন্ধু,তব মুখ পানে চেয়ে
তুমি কি আজিও সেদিনের সেই কৃষাণের ছোট মেয়ে ?
আজি মনে পড়ে সেই কবে তুমি হারায়ে নাকের নথ,
এই বালুচরে কাঁদিয়া কাঁদিয়া ভিজাইতেছিলে পথ।
সেই নথ আমি খুঁজিয়া দিলাম,—জানাতে কৃতজ্ঞতা।
মোর পানে চেয়ে আঁখি নোয়াইলে, মুখে ফুটিল না কথা।

তারপর সেই কত ছল করি কত ভাবে দেখা হ'ল ;
সেই সব কথা স্মরিয়া এখন আঁখি করে ছল ছল।
কোন দিন আমি লুকাইয়া থাকি গহন কাশের বনে
বাঁশের বাঁশীটি হাতেতে লইয়া বাজাতেম নিজ মনে।
সখীর সহিত জল নিয়ে যেতে, শুনি পরিচিত সুর
কাঁখের ঘড়াটি ভারি হয়ে যেতো, সখিরা বলিত,—"দূর !
পোড়ার মুখীর সবখানে দেরী,—থাক ও পথের মাঝে।"
তারা চ'লে যেতো তব রাঙা মুখ আরো রাঙা হ'ত লাজে !
পিছন হইতে সহসা যাইয়া ধরিতাম চোখ দুটি
চিনেও আমারে ছল করে ইহা বলিতে না মুখ ফুটি।
তারপর সেই দুজনে বসিয়া এমনি নদীর ধারে,
সোনার স্বপন কুড়ায়ে কুড়ায়ে গাঁথিতাম মোরা হারে।

আমি বলিতাম ওই বালুচরে বাঁধিব একটি ঘর
কদমের শাখা দোলাইবে ছায়া তাহার মাথার 'পর,
উঠানে তাহার বেঁধে দেব আনি বাঁশের জাঙ্‌লাখানি,
তুমি তারি তলে ঢাকাই সীমের বীজ লাগাইও আনি।
জাঙ্‌লা ভরিয়া হেলিবে দুলিবে ঢাকাই সীমের লতা
মোরা তারি পরে পড়িব মোদের গোপন প্রেমের কথা
তুমি বলিয়াছ, নবান্ন দিনে আটী আটী ধান শিরে
আসিও গাঁয়ের কৃষাণ আমার গেঁয়ো পথ দিয়ে ধীরে,
বরণ-কুলায় প্রদীপ সাজায়ে ধান দুর্ব্বার সাথে
তোমারে বরণ করিয়া লইব আমি আপনার হাতে।

এমনি করিয়া দিনেরে আমরা কথার মালিকা গাঁথি
সাজায়ে সাজায়ে করেছি তাহারে বিগত দিনের সাথী।—
তারা চলে গেছে, মোদের হাতের কল্পনা-ফুল লয়ে,
হিসাব করিতে ভুলে গেছে তারা কতবার গেল বয়ে।
কখনো তোমারে ডাকিয়া বলেছি—কালকে আসিও সই,
সন্ধ্যা আমার কাটিবে না কাল একেলা তোমারে বই।
তুমি আস নাই, দূর দিগন্তে ঢলিয়া প'ড়েছে বেলা,
আমি রাগ করে মিছেই তাহারে ছুড়িয়া মেরেছি ঢেলা।
সোনার কলস ভাঙিব তাহার সে যদি ডুবিতে চায়,
পিছে চেয়ে দেখি মৃদু মৃদু হেসে তুমি আসিতেছ হায় ;
তাড়াতাড়ি তুমি যেতে চাহিয়াছ, কাশের পাতার সনে
তোমার শাড়ীর আঁচল বাঁধিয়া হাসিয়াছি মনে মনে।
কুন্দ-কুসুম দন্ত দিয়া যে বাঁধন কেটেছ তার ;—
সেই সব কথা এখন সজনী মনে হয় বার বার।
কতদিন আমি তোমারে বলেছি শোনগো সোনার সই,
তুমি যদি হও সন্ধ্যার তারা, আমি যদি সাঁঝ হই ;
প্রতিদিন মোরা এমনি আকাশে এ উহার পানে চেয়ে,
মরণের দেশে ঘুমায়ে পড়িব মরণের গান গেয়ে।

আজিকে সজনী ফুরাল মোদের এ বালুচরের খেলা,
আমাদের ঘাটে ভিড়িয়াছে আসি পরদেশ হতে ভেলা।
আমি চলে যাব এক দেশে সখি তুমি যাবে আর দেশে
সেথায় মোদের এই বালুচর সাথে নাহি যাবে ভেসে।
মোরা যে স্বপন গড়েছিনু তাহে দেবতা হইল বাদী,
যা হবার তাই হইল, এখন কি হইবে মিছে কাঁদি।

তুমি চলে যাবে আমিও যাইব, এস তবে শেষ বার
এই বালুচরে লিখে রেখে যাই যত কথা আছে যার।
আমিও তোমারে ভুলিব সজনী, তুমি ভুলে যাবে মোরে,
বালুর আঙিনা বাঁধিলে কি হবে ? থাকে না জনম ভ'রে।
তোমারে আমারে ভুলাতে সজনী অনন্ত গ্রহতারা
অনন্ত সাঁঝ অনন্ত আলো হইবে আত্মহারা !
মহাকাল তার চক্রের ঘায়ে ছিঁড়িবে স্মৃতির ফুল
দিবস-রজনী দুটি ভাই বোন মালায় গাঁথিবে ভুল।
তুমি ভুলে যাবে, আমিও ভুলিব, অনাগত ভাই বোন
সহসা আসিয়া জুড়িয়া বসিবে মোদের হৃদয়-কোণ।
অনাগত ব্যথা অনাগত সুখ পাতিয়া কুহকজাল
ঢাকিয়া ফেলিবে মনের গহিনে আজিকার এই কাল।
সেই দূর দেশে হয়ত কখনো অজানা গ্রহের মত
মাঝে মাঝে এসে উঁকি মেরে যাবে এ কালের দিন যত।
সেই নদী তটে দাঁড়ায়ে কখনো হেরিব সুদূর পারে
ক্ষীণ-বালু-লেখা কল-ঢেউ সনে দুলিছে রূপালী হারে।
সেথা হ'তে কভু দূরাগত কোন গেঁয়ো রাখালের বাঁশী
আধ বোঝা-যায় আধ না বোঝায় শ্রবণে পশিবে আসি।

মুসাফির

চলে মুসাফির গাহি,
এ জীবনে তার ব্যথা আছে শুধু ব্যথার দোসর নাহি।
নয়ন ভরিয়া আছে আঁখিজল, কেহ নাই মুছাবার,
হৃদয় ভরিয়া কথার কাকলী, কেহ নাই শুনিবার।
চলে মুসাফীর নির্জ্জন পথে, দুপুরের উচু বেলা,
মাথার উপরে ঘুরিয়া ঘুরিয়া করিছে আগুন-খেলা।
দুধারে উধাও বৈশাখ মাঠ, রৌদ্রেরে বুকে চাপি,
ফাটলে ফাটলে চৌচির হয়ে করিতেছে দাপাদাপি।
নাচে উলঙ্গ দমকা বাতাস, ধূলার বসন ছিঁড়ে,
দিয়ে ফুঁ দিয়ে আগুন জ্বালায় মাঠের ঢেলারে ঘিরে।
দূর পানে চাহি হাঁকে মুসাফির, আয়, আয়, আয়, আয়,
কম্পন জাগে খর দুপুরের আগুনের হল্‌কায়।
তারি তালে তালে দুলে দুলে উঠে দুধারের স্তব্ধতা,
হেলে নীলাকাশ দিগন্তে বেড়ি বাঁকা বনরেখা-লতা।

চলে মুসাফীর দূর দুরাশার জনহীন পথপাড়ি,
বুকে করাঘাত হানিয়া সে যেন কি ব্যথা দেখাবে ফাড়ি।
নামে দিগন্তে দুপুরের বেলা, আসে এলোকেশী রাতি,
গলায় তাহার শত তারকার মুণ্ডমালার বাতি।
মেঘের খাড়ায় রবিরে বধিয়া নাচে সে ভয়ঙ্করী,
দূর পশ্চিমে নিহত দিনের ছিন্ন মুণ্ড ধরি।
রুধির লেখায় দিগন্ত ছায়, লোল সে রসনা মেলি,
হাসে দিগন্তে মত্ত ডাকিনী করিয়া রক্ত-কেলি।
চলেছে পথিক—চলেছে সে তার ভয়ঙ্করের পথে,
বেদনা তাহার সাথে সাথে চলে সুরের ইন্দ্ররথে।
ঘরে ঘরে জ্বলে সন্ধ্যার দীপ, মন্দিরে বাজে শাঁখ,
গাঁয়ের ভগ্ন মস্‌জিদে বসি ডাকে দুটো দাঁড়কাক।
কবরে বসিয়া মাথা কুটে কাঁদে কার বিরহিণী মাতা,
চলেছে পথিক আপনার মনে বকিয়া বকিয়া যা-তা।

চলেছে পথিক—চলেছে পথিক—কতদূর—কতদূর,
আর কতদূরে গেলে পরে সে যে পাবে দেখা বন্ধুর।
কেউ কি তাহার আশাপথ চাহি গণেছে বরষ মাস,
ধুঁয়ার ছলায় কাঁদিয়া কি কেউ ভিজায়েছে বেশবাস
কেউ কি তাহারে দেখায়েছে দীপ কোন গেঁয়ো ঘর হতে
মাথার কেশেতে পাঠায়েছে লেখা গংকিনী নদীসোঁতে ?

চলেছে পথিক চলেছে সে ললাটের লেখা পড়ি,
সীমালেখাহীন পথ-মায়াবীর অঞ্চলখানি ধরি ;

ঘরে ঘরে ওঠে মৃদু কোলাহল, বধূরা বঁধুর গলে,
বাহুর লতায় বাহুরে বাঁধিয়া প্রণয়-দোলায় দোলে।
বাঁশী বাজে দূরে সুখ-রজনীর মদিরা-সুবাস ঢালি,
দীঘির মুকুরে হেরে মুখ রাত চাঁদের প্রদীপ জ্বালি !
নতুন বধূর বক্ষ জড়ায়ে কচি শিশু বাহু তুলি,
হাসিয়া হাসিয়া ছড়াইছে যেন মণি-মাণিকের ধূলি।
চলিছে পথিক—রহিয়া রহিয়া করিছে আর্ত্তনাদ,—
ও যেন ধরার সকল সুখের জীবন্ত প্রতিবাদ।

রে পথিক, বল্, কারে তুই চাস, যে তোরে এমন ক'রে,
কাঁদাইল হায়, কেমন করিয়া রহিল সে আজ ঘরে ?
কোন্ ছায়াপথ নীহারিকা পারে, দেখেছিলি তুই কারে,
কোন্ সে কথার মাণিক পাইয়া বিকাইলি আপনারে !
কার গেহ-ছায়ে শুনেছিলি তুই চুড়ির রিণিকি-ঝিনি,
কে তোর ঘাটেতে এসেছিল ঘট বুড়াইতে একাকিনী !

চলে মুসাফির আপনার রাহে, কোন দিকে নাহি চায়,
দূর বনপথে থাকিয়া থাকিয়া রাত-জাগা পাখী গায়।
গগনের পথে চাঁদেরে বেড়িয়া ডাকে পিউ, পিউ কাঁহা,
সে মৌন চাঁদ আজো হাসিতেছে, বলিল না, উহু আহা।
বউ কথা কও—বউ কথা কও—কতকাল—কতকাল,
রে উদাস, বল্, আর কতকাল পাতিবি সুরের জাল।

সে নিঠুর আজো কহিল না কথা, রহস্য-যবনিকা
খুলিয়া আজিও পরা'ল না কারো ললাটে প্রণয়-টীকা ;
চলেছে পথিক চলেছে সে তার দূর দুরাশার পারে,
কোনো পথ বাঁকে পিছু ডাকে আজ ফিরা'ল না কেউ তারে।
চলেছে পথিক চলেছে সে যেন মৃত্যুর মত ধীরে,
যেন জীবন্ত হাহাকার আজি কাঁদিছে তাহারে ঘিরে।
চারিদিক হতে গ্রাসিয়াছে তারে নিদারুণ আন্ধার,
স্তব্ধতা যেন জমাট বেঁধেছে ক্রন্দন শুনি তার।

আর একদিন আসিও বন্ধু

আর একদিন আসিও বন্ধু—আসিও এ বালুচরে ;
বাহুতে বাঁধিয়া বিজলীর লতা রাঙা মুখে চাঁদ ভ'রে।
তটিনী বাজাবে পদ-কিঙ্কিণী, পাখিরা দোলাবে ছায়া ;
সাদা মেঘ তব সোণার অঙ্গে মাখাবে মোমের মায়া।
আসিও সজনী এই বালুচরে, আঁকা-বাঁকা পথখানি ;
এধারে ওধারে ধান-ক্ষেত তারে লয়ে করে টানাটানি !—
কখনো সে গেছে ওধারে বাঁকিয়া কখনো এধারে আসি,
এ'রে ও'রে লয়ে জড়াজড়ি করে ছড়ায়ে ধূলার হাসি।
এই পথ দিয়ে আসিও সজনী,—প্রভাতে ও সন্ধ্যায়,
দিগন্ত-জোড়া ধানের ক্ষেতের গন্ধ মাখিয়া গায়।
—চরের বাতাস, বাতাস করিয়া শীতল করিছে যারে ;
সেই পথে তুমি চরণ ফেলিয়া আসিও এ নদী পারে।

আর একদিন আসিও সজনী, এ মোর কামনাখানি,
মূক বালুচরে আখর এঁকেছি নখরে নখর হানি।

লিখিয়াছি তাহা পাখীর পাখায় মোর নিঃশ্বাস ঘা’য়ে ;
আর লিখিয়াছি দূর গগনের কনক মেঘের ছা’য়ে।
সেই সব তুমি পড়িয়া পড়িয়া অলস অবশ কায় ;
এইখানে এসে থামিও বন্ধু মোর বেণুবন-ছায়।—
এই বেণুবন মোর সাথে সাথে কাঁদিয়াছে বহু রাতি ;
পাতায় পাতায় জড়াজড়ি করি উতল পবনে মাতি।

এইখানে সখি সাক্ষ্য হইয়া রাতের প্রহরগুলি ;
কত যে কঠোর বেদনা আমার তোমারে বলিবে খুলি।
রাত-জাগা পাখী কহিবে তোমারে, আমার বে-ঘুম রাতি
কাটিতে কাটিতে কি ক’রে নিবেছে একে একে সব বাতি।
সেইখানে তুমি বসিও সজনী, মনে না রাখিও ডর,
সেদিন কাহারো কোন অভিযোগ হানিবে না কারো ’পর।
সেদিন আমার যত কথা সখি এই মূক মাটি তলে,
মোর সাথে সাথে ঘুমায়ে রহিবে মহা-মৃত্যুর কোলে।
এই নদী তটে বরষ বরষ ফুলের মহোৎসবে ;
আসিবে যাহারা তাহাদের মাঝে মোর নাম নাহি রবে।

সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে, অভাগা গাঁয়ের কবি ;
জীবনের কোন্ কনক বেলায় দেখেছিলে কার ছবি।
ফুলের মালায় কে লিখিল তারে গোরের নিমন্ত্রণ ;
কে দিল তাহারে ধূপের ধোঁয়ায় নিদারুণ হুতাশন।
সেদিন কাহারো পড়িবে না মনে কথা এই অভাগার ;
জানিবে না কেউ কত বড় আশা জীবনে আছিল তার।

ধরণীর বুকে প্রদীপ রাখি সে, আকাশেরে ডাক দিত,—
মাটির কলসে জল ভ'রে সেযে তটিনীরে বুকে নিত।
এত বড় আশা কি ক'রে ভাঙিল, কি ক'রে জীবন ভোরে,
রঙ-কুহেলীর সোণার বাসর ভাঙিল সিঁধেল চোরে।
এসব সেদিন স্মরিবে না কেহ, দুঃখ নাহিক তায় ;
যে গেল তাহারে ফিরায়ে আনিতে পিছু-ডাক নাহি হায়।
যে দুখে আমার জীবন দহিল সে দুখের স্মৃতি রাখি ;
সবার মাঝারে রহিব যে বেঁচে এর চেয়ে নাই ফাঁকি।

তুমিও আমারে ভেবো না সেদিন, আমার দুঃখ ভার ;
এতটুকু ব্যথা নাহি আনে যেন কোন দিন মনে কার।
এ মোর জীবনে তোমার হাতের পেয়েছিনু অবহেলা,—
এই গৌরব রহিল আমার ভরিতে জীবন-ভেলা।
তুমি দিয়েছিলে আমারে আঘাত, তারি মহা-মহিমায় ;
সবার আঘাত দলিয়া এসেছি এ মোর চরণ ঘা'য়।
তোমারে আমার লেগেছিল ভাল, আর সব ভাল তাই —
আমার জীবনে এতটুকু দাগ কেহ কভু আঁকে নাই।
তোমার নিকটে পেয়েছিনু ব্যথা তারি গৌরব ভরে,
আর সব ব্যথা খড়কুটা সম ছিঁড়িয়াছি নখে ধ'রে।
তুমি দিয়েছিলে ক্ষুধা
অবহেলে তাই ছাড়িয়া এসেছি জগতের যত সুধা।
এ জীবনে মোর এই গৌরব তোমারে যে পাই নাই,
আর কারো কাছে না-পাওয়ার ব্যথা সহিতে হয়নি তাই।
তোমার নিকটে কণিকা না পেয়ে আমি হয়েছিনু ধনী—
আমার কুটীরে ছড়াছড়ি যেত রতন মাণিক মণি।

তাই সেই শুভক্ষণে—
মোর পরে তব যত অন্যায় আনিও না কভু মনে।
আমারে যে ব্যথা দিয়েছিলে তুমি, তাতে নাহি মোর দুখ,
তুমি সুখে ছিলে, মোর সাথে রবে এই স্মরণের সুখ।
আর একদিন আসিও সজনী, মোর কণ্ঠের ডাক ;
যতদিন তুমি না আসিবে যেন নাহি হয় নির্ব্বাক।
এ মোর কামনা পাখী হ'য়ে যেন এই বালুচরে ফেরে ;
যেন বাজ হ'য়ে গগনে গগনে মেঘের বসন ছেঁড়ে।
এই কথা আমি ভ'রে রেখে যাই খর-তটিনীর জলে ;
যেন দুই কূল ভাঙিয়া সে চলে আপনার কল্লোলে।
আর একদিন আসিও সজনী, এ আমার অভিশাপ—
যতদিন যাবে পলে পলে এর বাড়িবে ভীষণ তাপ।
এই বাসনার ইন্ধন জ্বালি সাজালেম যেই হোম ;
কাল-নটেশের চরণের তালে জ্বলে যেন নির্ধূম।
যেন তারি দাহ সপ্ত আকাশ ভেদিয়া উপরে ধায়,
চন্দ্র সূর্য্য মুরছিয়া পড়ে তারি নিশ্বাস ঘা'য়।
যেন সে বহ্নি শত ফণা মেলি করে বিষ উদ্গার,
তারি দাহ হ'তে তুমি যেন কভু নাহি পাও উদ্ধার !—
যতদিনে তুমি এই বালুচরে নাহি আস পুন ফিরে,—
আজি এই কথা লিখে রেখে যাই বালুকার বুক চিরে।